অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 212-219
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.030

ATTOKATHANE KANAN DEBI / আত্মকথনে কানন দেবী

DR. SANGITA DAS / ড. সঙ্গীতা দাস
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার, ইতিহাস বিভাগ, কাজী নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়
Email: dassangita786@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:

পরিচালক, সমাজ, অভিনেত্রী, আত্মকথন, চলচ্চিত্র, সম্মান, অভিনয়, সঙ্গীত

Abstract:

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে প্রথমপর্বে যেসকল অভিনেত্রীরা নিজ চেষ্টা ও কর্মক্ষমতার দ্বারা প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে খ্যাতি ও সম্মানের শীর্ষস্থান অর্জন করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে কানন দেবী হল অন্যতম। তাঁর জন্মসাল, জন্মস্থান, পিতৃপরিচয় তথা বংশপরিচয় নিয়ে বিতর্ক বর্তমান। দারিদ্রতার কারণে বাল্যকালে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ, একের পর এক সিনেমায় অভিনয়, অভিনয়ের সাথে সাথে গানে ছিল তাঁর স্বাভাবিক নৈপুন্য। তিনি সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এই সময়ে তাঁর বৈবাহিক জীবনের সূচনা, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পূর্ণবিবাহ, তাই নিয়ে বঙ্গসমাজে সমালোচনার ঝড় উঠল। প্রথম মহিলা শিল্পী হিসাবে নিজস্ব প্রোডাকশন কোম্পানি খোলা ও তাতে একের পর এক হিট ছবি পরিবেশন। দুঃস্থ মহিলা শিল্পীদের সাহায্যার্থে 'মহিলা শিল্প মহল' গঠনও নানা সমাজকল্যানমূলক কাজে অংশগ্রহণ। নিজস্ব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আত্মকথনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা। এক কথায় বলতে গেলে শূন্য থেকে সাম্রাজ্ঞী হয়ে ওঠার এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হলেন কানন দেবী।

Discussion:

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা চলচ্চিত্র জগতে নারীদের যে অংশগ্রহন এবং সেই অংশগ্রহনের মধ্যে দিয়ে যেসকল নারীরা উঠে এসেছিলেন তাদের মধ্যে কানন দেবী ছিলেন অন্যতম। চরম দারিদ্রের মধ্যে কেটে ছিল তাঁর শৈশবকাল কিন্তু সেই দারিদ্র কেড়ে নিতে পারেনি তাঁর স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এই দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পেয়ে মর্যদাপূর্ণ সুস্থ জীবনের, গানে ও অভিনয়ে ছিল তাঁর স্বাভাবিক নৈপূন্য, প্রচুর শ্রম ও চর্চা তাঁকে পরিনত করেছিল এক অসাধারণ প্রতিভাময়ী ব্যক্তিত্বে, বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম স্টার অভিনেত্রী, ফিল্ম ইন্ডাস্টির মুকুটমণি, অভিনয়ে সংগীতে অনন্যা, সমাজে বহুধা বিস্তৃত কল্যানকর্মে পুরোধাস্থানের অধিকারিনী – এক কথায় দীপ্তিময়ী ব্যক্তিত্ব যাঁকে অনায়াসে dimensational personality [১] বলা যায়। তাঁর পূর্ব নাম কাননবালা দাস, সেখান থেকে কানন দেবী হয়ে ওঠা দীর্ঘশ্রমসাধ্য পথ। তাঁর জীবনের নানান উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে কীভাবে অনন্য সাধারণে পরিনত হল সেই বিষয়ে আমার আলোচনা।

চলচ্চিত্র জগতে প্রথম পর্বে যে সকল অভিনেত্রীরা নিজেদের অসীম ধৈয্য, কর্মক্ষমতা, নিরলস চেষ্টা, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে প্রতি মূহুর্তে লড়াই করে নিজেকে খ্যাতি, ঐশ্বর্য, সমাজের এক সম্মানিয় স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন তাদের মধ্যে কানন দেবী ছিল অনন্য ব্যক্তিত্ব।তিনি বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম স্টার অভিনেত্রী, ফিল্ম ইন্ডাস্টির মুকুটমণি, অভিনয়ে সংগীতে অনন্যা, সমাজে বহুধা বিস্তৃত কল্যানকর্মে পুরোধাস্থানের অধিকারিনী – এক কথায় দীপ্তিময়ী ব্যক্তিত্ব যাঁকে অনায়াসে dimensational personality বলা যায়।তাঁর জীবনের নানান উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে কীভাবে অনন্য সাধারণে পরিনত হল সেই বিষয়ে আমার আলোচনা। কানন দেবীর জন্মসাল কবে তা নিয়ে বিতর্ক বর্তমান, কারোর মতে ১৯১৬, আবার কারোর মতে ১৯১৮, কিন্তু স্বয়ং কানন দেবী ১৯৮১ সালে "দ্যা ইলাস্টেটেড উইকলি" পত্রিকায সাক্ষাতকারে নিজের জন্মসাল ১৯১৬ বলেছেন,তাঁর 'সবারে আমি নমি' বইয়ে তিনি বলেছেন, 'জয়দেব' ছবিতে অভিনয়ের সময় তিনি "ন-দশ বছরের এক অনভিজ্ঞ মেয়ে"।[২] সুতরাং ১৯১৬ সালকেই তাঁর জন্মসাল হিসাবে গ্রহন যুক্তিযুক্তো। তাঁর জন্মসাল কোথায় এই বিষয়েও ধোঁয়াশা বর্তমান। মেঘলা সেনগুপ্ত তার গ্রন্থে এবিষয়ে আলোকপাত করে বলেছেন, 'বালিকা কাননকে প্রথম পাওয়া যায় হাওড়ার এক গরীব পাড়ায়। হাওড়ায় এক কনভেন্ট স্কুলে ওর নাম লেখানো হয়েছিল, কিন্তু মাইনে জোগানো যায়নি বলে তাঁকে বার করে আনতে হয়। আরেকটি জনশ্রুতি আছে, ওঁকে শিশু অবস্থায় আনা হয় ভাগলপুরে গঙ্গা তীরবর্তী রাজবাটী আদমপুরের পোস্তা বাগানবাড়িতে। সেটা ছিল স্ববর্ণিত 'রাজা' শীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসতবাড়ি ভদ্রলোক পেশায় উকিল, শিশুকাননকে ওঁর কাছে আনা হয় কলকাতার হাড়কাটা গলি থেকে।এবং পাঁচ-ছয় বছর বয়েসে কলকাতায় ফিরিয়ে দেওয়া হয় বায়োস্কোপে নেমে কিংবা গান গেয়ে রুজি করতে।[৩]

কেবল তাঁর জন্মসাল ও জন্মস্থান নয়, তাঁর পিতৃপরিচয় নিয়ে ধোয়শা বর্তমান। জনশ্রুতি আছে তিনি দর্জির মেয়ে মা বাঈজি, আবার কারোর মতে তিনি উঠে এসেছেন পতিতা পল্লী থেকে।[৪] এই বিষয়ে কানন দেবী তাঁর আত্মকথনে বলেছেন, "----- আমার বাবা শ্রী রতনচন্দ্র দাস মার্চেন্ট অফিসে কাজ করতেন। এছাড়া সোনা রূপার ছোটখাটো দোকান ও ছিল। আয় মন্দ ছিল না, কিন্তু নানারকম কুঅভ্যাসের জন্য তার আয়ের চেয়ে ব্যায়ের অঙ্কটা ছিল বেশী এবং সেই কারণে আমাদের জন্য মোটা অঙ্কের ঋণ ছাড়া আর কিছু রেখে যেতে পারেনি"।[৫] এখানে তিনি স্পষ্ট ভাবে তাঁর পিতার নাম, পেশা, স্বভাব চরিত্র বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছেন।
পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর বালিকাটির জীবনে নেমে আসে চরম দুরবস্থা, নিঃসহায় মায়ের হাত ধরে তারা

গিয়ে উঠলেন এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে। অনেক দয়া ভিক্ষা করে আশ্রয় পাওয়া গেলেও আশ্রয়দাতা তার বাড়ির সমস্ত কাজের লোক ছাড়িয়ে দেন। সেই বাড়িতে বিনা বেতনে পরিচারিকার কাজ করা সত্বেও তাদের কপালে জুটত কটুবাক্য, একদিন সামান্য কারণে মাকে লাঞ্ছিত হতে দেখে সহ্যের বাঁধ ভাঙল তাঁর। সে মায়ের হাত ধরে রাস্তায় আশ্রয় নিল ।যদিও সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে মাথা গোঁজার আস্থানা পাওয়া গেল, কিন্তু সংসার চলবে কী করে? এই চিন্তা ছোট্ট মেয়েটিকে তাড়া করতে লাগল। এমন সময় তাদের পরিচিত এক ব্যাক্তি তাঁকে নিয়ে যান ছবিতে কাজ করানোর জন্য, মা ও দিদির অনিচ্ছা সত্বেও ভালোভাবে বাঁচার তীব্র আকাঙ্খাকে সম্বল করে তিনি প্রবেশ করলেন চলচ্চিত্র জগতে। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন,- "---- জীবনধারনের প্রয়োজনে অভিভাবকহীন, অসহায় এক বালিকা ঐ একটি পথের সন্ধানই পেয়েছিল এবং স্রোতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার চরম মূহুর্তে মরীয়া হয়ে খড়কুটোকে অবলম্বন করে বাঁচবার প্রচেষ্টার মতো তাঁকে প্রাণপনে আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে চেয়েছিল"।[৬]

১৯২৬ সালে 'ম্যাডাম থিয়েটার' এর ব্যানারে, জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'জয়দেব' ছবিতে রাধার ভূমিকায় তাঁর প্রথম অভিনয়। সেই পর্বে ছবি ছিল নির্বাক, সিনেমায় অভিনয়ের দক্ষিনা স্বরূপ তাঁর জন্য ধার্য করা হয়েছিল পঁচিশ টাকা। কিন্তু বাস্তবে তিনি পান মাত্র পাঁচ টাকা, বাকি কুড়ি টাকার হিসেব পাওয়া যায়নি।এক্ষেত্রে তাঁর উক্তি ছিল , " ------আমার অনভিজ্ঞতার খেসারত মাত্র কুড়ি টাকার ওপর দিয়ে যদি গিয়ে থাকে সে আর কী এমন বেশি, তবুও পাঁচটা টাকাতো পেয়েছি, ---- এইভাবে আমি চিরদিন জীবনের গরমিলের হিসেব মিলিয়ে এসেছি। তাতে আর যাইহোক, ক্ষতি হয়নি অন্তত গোজামিল হয়নি।তাতে আমি খুশী।[৭]

১৯২৭ সালে 'ইন্ডিয়ান সিনেমা আর্টস' এর ব্যানারে "শঙ্করাচার্য" ছবিতে একটি ছোট্ট ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন। ছবিটি তেমন সফল হয়নি, এর পর ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি 'ম্যাডান থিয়টার' এর সুরকার হীরেন বসুর সঙ্গে গান রেকর্ড করেন এবং 'কলবিয়া' ও 'মেগাফোন কোম্পানির' থেকে বেশ কিছু গান রেকর্ড করেন। এই গানের সূত্র ধরে তিনি কাজী নজরুল ইসলামের সান্নিধ্য লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর আত্মকথনে লিখেছেন, " ----- "তাঁর কবিত্বকে উপভোগ করা যতখনি সহজ, ব্যাক্তিত্বকে বোঝাটা ঠিক ততখানি সহজ নয়"।[৮]

১৯৩১ সালে 'ম্যাডাম থিয়েটার' এর ব্যানারে 'জোর বরাত' ছবিতে নায়িকারূপে প্রথম সবাক চরিত্রে অভিনয়। এই ছবিতে ঘটে যায় তাঁর জীবনের একটি বড়ো ঘটনা যা তাঁর ব্যাক্তিসত্বা তথা অন্তরআত্মাকে ভীষনভাবে আঘাত করেছিল। এই ছবির একটি দৃশ্যগ্রহণের শেষ মুহূর্তে তাকে না জানিয়ে পরিচালক একটি চুম্বনের দৃশ্য রাখেন কিন্তু দৃশ্যটি ঠিকমতো পরিবেশনযোগ্য না হওয়ায় সেটি বাতিল হয়ে যায়। এই দৃশ্যটির জন্য তিনি যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেছিলেন যা তাঁর আত্মকথনে প্রকাশ পায়,- "----- ঘটনার আকস্মিকতায় হঠাৎ বিহ্বল হয়ে পড়লাম। সামলে উঠতে সময় লাগল। যখন প্রকৃতিস্থ হলাম, বিস্ময়, বেদনা, অপমান, নিজের অসহায় অবস্থার জন্য কষ্ট সব মিলিয়ে একটা নিষ্ফল কান্না যেন মাথা কুটতে লাগল।"[৯]

এরপর ম্যাডাম থিয়েটার এর ব্যানারে 'ঋষির প্রেম' ছবিতে নায়িকারূপে, 'প্রহ্লাদ' ছবিতে নারদ ও 'বিষ্ণুমায়া' ছবিতে পুরুষ চরিত্রে(নারায়ন ও কৃষ্ণের) অভিনয় করেছিলেন। সে সময় প্লে-ব্যাক পদ্ধতিতে গান রেকর্ড় করা হত না, আর একসঙ্গে গান ও অভিনয় জানা পুরুষ অভিনেতা পাওয়া সহজসাধ্য না হওয়ায় কানন দেবীর এই প্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছিলেন পরিচালক জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায়। ১৯৩২ সালে 'রাধাফিল্ম' এ দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে

আবদ্ধ হন তিনি। এই বছরই 'শ্রীগৌরাঙ্গ' ছবিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে এবং 'মা' ছবিতে অভিনয় ও গানের জন্য 'প্রতিভাময়ী' শিল্পী হিসাবে শিল্পীরসিক সমাজে সমাদৃত হন।এই ব্যাপক সন্মান লাভের পরও প্রয়োজক – পরিচালকদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজের সম্মান বাঁচাতে সদাসতর্ক থাকতে হত। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন, "------এ যেন ক্ষুরের ধারে চলা – এদিকে পড়লে খাঁদ ও দিকে গহর। যদি এদের খেয়াল খুশির কাছে আত্মসর্ম্পন করতাম, তবে তলিয়ে যেতাম কোন অতল। আবার এদের অমান্য বা অস্বীকার করার জোর কোথায়"?[১০] এই রকম দ্বন্দ্বে তিনি যতই অস্থির হয়েছেন ততই দৃঢ় হয়েছে তাঁর আত্মবিশ্বাস ও প্রতিকূলতাকে জয়ের এক তীব্র বাসনা।

১৯৩৫ সালে 'বাসবদত্তা' ও 'মানময়ী গার্লস স্কুল' মুক্তি পায়। পরবর্তী ছবিটির জন্য তিনি বিশেষভাবে সন্মানিত হন। এই পর্বে কেবলমাত্র বাংলায় নয় হিন্দি ও উর্দুতে নির্মিত বেশ কিছু ছবিতে তিনি অভিনয় করেন. ১৯৩৬ সালে "কৃষ্ণ-সুদামা", 'বিষবৃক্ষ' হিন্দি সংস্করণ খুনী কৌন , চার দরবেশ , সাথী হিন্দিতে স্ট্রিট সিংগার , সাপুড়ে (হিন্দি ও বাংলায়), অভিনেত্রী হিন্দিতে হারজিত, যোগাযোগ, পথ বেধেঁ দিল, তুমি আর আমি, এই সকল প্রতিটি ছবি জনপ্রিয়তার চূড়ায় স্পর্শ করেছিল। এই সকল ছবিতে অভিনয়ে তার বিপরিত দিকে ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া ,পাহাড়ী সান্যাল, কে এল সায়গল, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলি, কৃষ্ণচন্দ্র দে, দূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায় প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর অভিনেতারা।

নিউ থিয়েটার্স এর ব্যানারে প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে অভিনিত 'মুক্তি' ছবিটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। এই ছবিতে প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীত ব্যবহার করা হয়। এর পর থেকে বাংলা চলচ্চিত্রে একের পর এক রবীন্দ্র সঙ্গীত ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় হতে থাকে। 'মুক্তি' ছবি হিট করার পর হিন্দুস্থান রেকর্ডে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাথে প্রথম পরিচয় হয় কানন দেবীর। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেন, "এ হল কানন, তারকা অভিনেত্রী"। কানন দেবী প্রনাম করতেই রবীন্দ্রনাথ ওঁর ঠোট ছুয়ে বলেছিলেন, "কী সুন্দর মুখ তোমার। গান করো?" কবির মনেছিল না এই মেয়েটাই 'মুক্তি' ছবিতে ওঁর গান গেয়েছে। প্রশান্তচন্দ্র তখন যোগ করলেন, "ও তো আপনার গান গেয়ে বিখ্যাত"। রবীন্দ্রনাথ তখন বলেছিলেন, "তাই? তা হলে একবার শান্তিনিকেতনে এসে গান শুনিয়ো আমাকে"।[১১] সেই সৌভাগ্য আর কাননদেবীর আর হয়নি।

গানের প্রতি কাননদেবীর টান ছিল ছোটবেলা থেকেই, চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর অর্থ সঙ্কট লাঘব হলে সঙ্গীত শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন তিনি। এই সময় আল্লারাখা নামে লক্ষ্মৌয়ের এক ওস্তাদের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা লাভ করেন। পূর্বী, ভৈরো, ইমন, বেহাগ প্রমুখ রাগ তালিম নেন তাঁর কাছ থেকে। তিনি কাননদেবীকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন "বেটি আচ্ছেসে রেওয়াজ করো । দেখোগে সারি হিন্দুস্থানমেঁ কিতনি ইজ্জত হোগি,রাজা ওয়াজির তুমহে সেলাম করেঙ্গে"।[১২] তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষা লাভ করেছিলেন অনাদি দস্তিদারের কাছে। এছাড়া অন্যান্য গানের ক্ষেত্রে পঙ্কজ মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, কাজী নজরুল ইসলাম, কমল দাসগুপ্ত, ভীস্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছে শেখার সুযোগ পান। বাইরের জগতের কাছে অভিনেত্রী হিসেবে পরিচয়টা বড়ো হলেও তাঁর নিজের কাছে সবচেয়ে দামীছিল তাঁর গানের ভূবন। পঙ্কজ কুমার মল্লিক তাঁকে বলেছেন, 'ফাস্ট সিঙ্গিংস্টার অফ নিউথিয়েটার্স'।[১৩]

১৯৪০ সালে ডিসেম্বর মাসে, বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা তথা শিক্ষাবিদ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের অক্সফোর্ড ফেরত পুত্র অশোক মৈত্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়। কাননদেবী তাঁর আত্মকথনে তাঁর প্রথম স্বামীর নাম উল্লেখ না করলেও এই বিষয়ে বলেছেন---"--- আজ সকৃতঙ্গচিত্তে শুধু এই কথাই স্বীকার করব আমার জীবনে প্রথম

.

প্রতিষ্ঠা ও সন্মান তাঁরই দেওয়া”।[১৪] তাঁদের এই বিবাহ তৎকালীন সমাজ তথা অশোকে মৈত্রের পিতা নীতিবাদি অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মেনে নিতে পারেননি। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। আলোড়ন ওঠে তৎকালীন বঙ্গসমাজে, সিনেমার নায়িকা তথা গায়িকাকে পর্দাতেই ভালো লাগে, তাকে নিয়ে সংসার করা যায় না এই ছিল তখনকার মানসিকতা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, - “কী হীন সমালোচনা সকলের মুখে। কী নির্দয় লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে ব্যাথা মৌন দিনগুলো কেটেছে তা বোঝানোর ভাষা নেই। আজও মনে পড়ে বারান্দায় দাঁড়াতে সাহস করতাম না। পাছে কারোর বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়। নানান কুরুচিপূর্ণ কদর্য প্যামপ্লেট ছাপিয়ে উচুঁ স্তর হেঁকে বিক্রী করত আমার বাড়ির সামনে। বাইরের আঘাত অন্তরের দ্বন্দ্ব মিলে প্রতি মুহূর্তের সে দুর্বিষহ যন্ত্রনার জ্বালাময় অনুভূতি আজ এত বছর বাদেও ভূলতে পারিনি।[১৫]

মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই এই বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। অশোক মৈত্র চেয়েছিলেন তিনি সরে আসুক এই চলচ্চিত্র জগত থেকে, কিন্তু স্বামীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি এই প্রস্তাব মেনে নেয়নি। তাদের আইন মাফিক বিচ্ছেদ ঘটলেও অশোক মৈত্রের মা কুসুমকুমারী মৈত্র ও বোন রানী ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ দম্পতির সঙ্গে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটেনি। ১৯৪৭ সালে তিনি প্রথমবার মহলানবিশ দম্পতির সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণে যান। বিদেশ ভ্রমণের চেয়ে তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল ওই সকল দেশের স্টুডিওগুলির প্রতি। এই পর্বে তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে ভিভিয়েন লে, ব্লার্ক গ্যাবেল, স্পেন্সার ট্রেসি, ক্যাথরিন হেপবার্ণ,অ্যাডলফ মেঞ্জো, রবার্ট ইয়াং, রবার্ট বিয়ন, মিরনা লয় প্রমুখ বিশ্বখ্যাত শিল্পী ব্যাক্তিদের সাথে’।[১৬] ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট লন্ডনের ‘ইন্ডিয়ান হাউসে’ এক সম্বর্ধণা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলনের পর তিনি প্রথম গেয়েছিলেন ‘আমাদের যাত্রা হল শুরু’ গানটি।[১৭] হলিউড গ্রামাফোন কোম্পানি তাকে বিশেষ সম্বর্ধণা জানিয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে। ১৯৪৯সালে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন ক্যাপ্টেন হরিদাস ভট্টাচার্যকে, তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাটজুর এ ডি সি । এ বিষয়ে হরিদাস ওঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, -“ এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম ডঃ কাটজুর সঙ্গে, সেখানেই দেখা কাননবালার। প্রায় বাধ্য হয়েই সেখানে এসেছিল কাননবালা। সারাক্ষন মঞ্চে থেকেও একটা কথাও বলেনি”।[১৮] বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে আবার সমাজে সমালোচনার ঝড় উঠল এবং কাগজপত্রে লেখালেখি শুরু হল। জীবনের সায়হ্নে পৌছে এ বিষয়ে তিনি ব্লেছেন, - “ যখন হরিদাস ভট্টাচার্যকে বিয়ে করি তখন লোকের ধারনা ছিল এবিয়ে পনেরো দিন টিকলে হয়। সেই বিয়েই তো চল্লিশ বছর টিকে গেল”।[১৯]

দীর্ঘ অভিনয় জীবনে বহু পরিচালক, প্রযোজক ও শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তিনি অর্জন করেছিলেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে বাস্তবায়িত করতে চাইলেন জীবনের একটি সুপ্তবাসনা নিজস্ব প্রোডাকশন কোম্পানি খোলার। ১৯৪৮ সালে ‘শ্রীমতি পিকচার্স’ মধ্যেদিয়ে তা বাস্তবায়িত হয়। কাননদেবী ছাড়াও এতে ছিলেন অজয় কর্র(ক্যামেরাম্যান), বিনয় চ্যাটার্জ্জী (চিত্রনাট্য লেখক)এই তিনজনকে নিয়ে গড়ে ওঠে সব্যসাচী ইউনিট। পরবর্তীকালে এই ইউনিটে যোগ দিয়েছিলেন তাঁর স্বামী হরিদাস ভট্টাচার্য, প্রনব রায় (গীতিকার), ফনীন্দ্র পাল (প্রচার সচিব), তরুণ মজুমদার (পরিচালক) প্রমুখ ব্যাক্তিরা। ‘শ্রীমতী পিকচার্স’ এর ব্যানারে প্রথম ছবি ‘অনন্যা’ (১৯৪৯); এরপর ‘মজদিদি’ (১৯৫০); ‘দর্পচূর্ণ’ (১৯৫২); ‘নববিধান’ (১৯৫৪); ‘দেবত্র’ (১৯৫৫); ‘আশা’ (১৯৫৬); ‘ইন্দ্রনাথ’, ‘শ্রীকান্ত’ ও ‘অন্নদাদিদি’ (১৯৫৯)। এই সকল ছবির কোনটিতে নায়িকা রূপে আবার কোনটিতে মূল চরিত্রে রূপদান করেছেন তিনি।। আবার ‘বামুনের মেয়ে’ ‘রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত’, ‘আধারে আলো’, প্রমুখ ছবিতে তাকে পাওয়া যায় অভিনেত্রী রূপে নয় প্রযোজক হিসাবে। দু- একটা ছবি ছাড়া ‘শ্রীমতী পিকচার্স’ এর বেশীরভাগ ছবিই ছিল শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে ও হরিদাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায়।

শ্রীমতি পিকচার্স, এর ব্যানারে নির্মিত 'মেজদিদি' ছবিটি ১৯৫১ সালে শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে স্বীকৃতি পায়। হরিদাস ভট্টচার্য পরিচালিত 'আঁধারে আলো' ছবিটি রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার পান ১৯৫৮ সালে । ছবিটি কার্লোভি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখাবার জন্য নির্বাচিত হয়, সেই উপলক্ষে তারা দুই জনে বিদেশ যাত্রা করেন।[২০] ১৯৫৯ সালে ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি তাঁর শেষ অভিনয়। তখন তাঁর বয়েস ৪৩ বছর, এরপর তিনি ৩৩ বছর জীবিত ছিলেন, অভিনয় জগত থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিয়েছিলেন।কাননদেবী ছিলেন অত্যন্ত আত্মসচেতন নারী। তিনি জানতেন কোথায় থামতে হয়, গান ও অভিনয় থেকে সরে গেলেও তাঁর কাজ বিন্দুমাত্র থেমে থাকেনি। স্টুডিওর বাইরে এককালের নাম করা এক মহিলা শিল্পীকে অর্থভিক্ষা করতে দেখে খুবই বিচলিত হন তিনি। বাংলার মহিলা শিল্পীদের নিয়ে একটি সংস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবেন, এই সংস্থার উদ্দেশ্যছিল অবসর সময়ে নাটক মঞ্চস্থ করে তার সঞ্চিত অর্থে দুঃস্থ মহিলা শিল্পীদের আশ্রয়ের সংস্থান করা সমমনোভাবাপন্ন মলিনা দেবী, রেনুকা রায়, সরয়ূবালা দেবী, সুনন্দা বন্দোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী দেবী, প্রমুখ অভিনেত্রীদের নিয়ে গড়ে তুললেন 'মহিলা শিল্প মহল'। এই বিষয়ে সমকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, "First of its kind in India".[২১]
'মহিলা শিল্প মহলের' অভাবনীয় সাফল্যের পর বিভিন্ন সমাজকল্যাণ মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হবার অনুরোধ আসতে থাকে। কিন্তু তিনি সময়াভাবের কারণে মাত্র দুটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলেন। প্রথমটি তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষিকা তথা বন্ধবী বীনাদেবী সেনের বাবা-মার নামে গঠিত 'মহেন্দ্র-জ্ঞনদা স্মৃতি সমিতি ', আর দ্বিতীয়টি – সুতারা ঘোষের 'উইমেনস কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন'।[২২]

কাননদেবী অভিনয় ছেড়েদিলেন, কিন্তু জনসমক্ষে এসেছেন , ছবি প্রযোজনা করেছেন, সমাজসেবা মূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন, আত্মজীবনী লিখেছেন। এই ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য ছিল – "তা বলে কী কাজ থেমে থাকবে, কর্ম বিরতি মানে মৃত্যু। নদীর গতিপথের মতো কাজের ধারার পরিবর্তন ঘটবে, নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরী করে নিতে হবে। জীবনের সকল চিন্তা, আবেগ ও কর্মশক্তি দিয়ে সেই নতুন কাজের জগতকেই সার্থক করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। সার্থক হওয়া না হওয়া আমাদের হাতে নেই। কিন্তু উদ্যোগকে নিভতে দেওয়া চলবে না। অসংখ্য কর্ম ও বন্ধনেই জীবনের আনন্দ – তবে লক্ষ্য রাখতে হবে বন্ধনটা যাতে মানুষের প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাজাত ভালবাসার বন্ধন হয়। এযেন শৃঙ্খল হয়ে উঠে জীবনের গতিপথ রুদ্ধ না করে"।[২৩]
বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রথম পর্বের মহিলা অভিনেত্রী তথা গায়িকার আত্মজীবনী হিসাবে 'সবারে আমি নমি' বইটি সুধি সমাজের কাছে বিশেষ সমাদর পায়। এটি প্রথমে তৎকালীন জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃত বাজার'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও কাননদেবী এটিকে আত্মজীবনী বলতে রাজি নন, তাঁর মতে –" অনেক সময় ঘটনার জঞ্জাল স্তূপে সত্যের রূপকে আবৃত করে বলেই আমার বিশ্বাস"।[২৪] তিনি এই বইটিতে কেবল মাত্র নিজের জীবন সংগ্রাম তুলে ধরেন নি, নায়িকা থেকে শুরু করে স্টুডিওর বেয়ারা, বাগানের মালি তথা তাঁর পোষ্য কুকুরটি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। মনুষ্য চরিত্রে জটিল দিকগুলো ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। তিনি লিখেছেন, "—এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা মানুষের দুঃখে দুখী হয় করুণা করতে পারেন, কিন্তু সুখের দিনে হাতে হাত মিলিয়ে বলতে পারেন না। তোমার সুখে আমিও সুখি, তোমার আনন্দে আমিও আনন্দিত। এ অভিজ্ঞতায় বেদনা যতখানি পেয়েছি তার চেয়ে বৃস্মিত হয়েছি অনেক বেশী"।[২৫]

কেবল মাত্র জন্মপরিচয় বা বংশপরিচয় এর দ্বারা কোন মানুষের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়, মানুষটির কর্মপচরিচয় এবং সমাজ ও দেশের প্রতি তার অবদানই হয়ে উঠতে পারে তার মূল্যায়নের সঠিক উপকরণ। চূড়ান্ত দারিদ্রতা আর প্রভূত অবমাননাকে অতিক্রম করে চলচ্চিত্র জগতে বিশেষ অবদান রাখার জন্যই তিনি অর্জন করেছিলেন

সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও মর্যাদার বিশেষ আসন। জীবনে সফলতার পুরষ্কার স্বরূপ ১৯৬৮ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে পান 'পদ্মশ্রী' সন্মান,। ১৯৭৭ সালে 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরষ্কার, ১৯৯০ সান সিনে সেন্ট্রাল এর হীরালাল সেন পুরষ্কার এবং ১৯৯১ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি-লিট' উপাধিতে সন্মানিত হন।[২৬] এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর জীবনাবসান হয় ১৯৯২ সালের ১৭ই জুলাই। সুতরাং শিল্পী তথা মানুষ হিসেবে তিনি যে এক বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব সে কথা নিসন্দেহে বলা যায়। তাঁর সম্পর্কে অভিনেতা বিকাশ রায় বলেছেন,, - "জীবিত অবস্থায় লিজেন্ড হয়ে গেছেন কাননদেবী – বাংলা ফিল্মে ওঁর দ্বিতীয় আর একটিও পাওয়া যাবে না"।[২৭]

Reference:

1. কানন দেবী; সবার্ব আমি নমি ; এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মাঘ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ – ২
2. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ – ৫
3. Mekhla Sengupta; "Kanan Devi: The First Superstar of Indian Cinema", Harper Collins Indian Ltd, 2015, page – 20-22
4. Mekhla Sengupta; op.cit, p.p 18
5. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ – ৩
6. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ – ৬
7. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ – ৭
8. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ – ৪৪
9. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ –৯-১০
10. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ – ১৬
11. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ – ১৬০
12. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ – ৪১
13. ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল; 'বৈশাখীঃ শতবর্ষে কাননদেবী, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক বিষয়ক ষাণ্মাসিক, কলকাতা, ২০১৬-২০১৭, পৃ-২
14. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ – ৭২
15. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ – ৬৯
16. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ – ১০৬
17. গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ,'সোনার দাগ' যোগমায়া প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ- ৮৮
18. শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, 'কাননবালা' প্রবন্ধ, আনন্দবাজার পত্রিকা ২১শে মে ২০১৬, পৃ – ৩
19. ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ – ৫০-৫২
20. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ – ১২১
21. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ – ৪৪
22. ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ – ৪৪
23. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ –১৫১
24. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ –২৫

25. কানন দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ –১৮
26. ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ -২২-২৩
27. ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ -১২